



# ‘যৌন হয়রানি’ ‘যৌন পীড়ন’ ‘লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন’কে- ‘না’

লীনা রহমান

সকল সময়ের গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাটি এখন আবারো নতুন মাত্রা নিয়ে আলোচনায় এসেছে তা হল ‘নারীর প্রতি অশালীন আচরণ’(ইভ টিজিং)। ইভ টিজিং এতদিন ভুক্তভোগী মেয়ের জীবনে ও পরিবারে নারীকীয় পরিবেশ তৈরি করে এসেছে এবং অনেকক্ষেত্রে মেয়েটিকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ে বা অকাল্মত্যুর পথ দেখিয়েছে। কিন্তু আমাদের অবহেলা, নিষ্ঠার্কতা ও চেখ-কান বন্ধ করে দেখেও না দেখার মানসিকতা একে এতটাই শক্তিশালী করে তুলেছে যে তা আজ এক মা ও এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে- যাদের অপরাধ ছিল এ ঘৃণ্য ব্যাপারটার প্রতিবাদ করা। আমি নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর কলেজের রসায়নের প্রভাবক মিজানুর রহমান এবং ফরিদপুরের মধুখালীর চাঁপা রাণী ভৌমিকের কথা বলছি। ইভ টিজিং-এর প্রতিবাদ করার কারণে শিক্ষক মিজানুর রহমানকে এবং নিজের মেয়ে উত্ত্যক্ত হওয়ার ঘটনার প্রতিকার চাওয়ায় মা চাঁপা রাণী ভৌমিককে মোটর সাইকেল চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়। এখন এ ব্যাপারটা নিয়ে উত্তল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমরাই কীভাবে বাড়িয়ে তুলেছি তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব এই লেখায়।

প্রথমত, ইভ টিজিং শব্দটিই এর ভয়াবহতা ও ভুক্তভোগী নারীর উপর এর যে প্রভাব পড়ে সে তুলনায় একটি খুবই হালকা শব্দ। পুলিশ বা অনেক মানুষ এ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয় না কারণ নামটিই এই অপরাধের যথাযথ গুরুত্ব প্রকাশ

করতে অক্ষম। তাই অনেক সচেতন মানুষই এক্ষেত্রে “যৌন উৎপীড়ন” বা “যৌন হয়রানি” বা “লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন” এ শব্দগুলো বলার পক্ষপাতী। কারণ বখাটেদের মন্তব্য বা পিছু নেওয়া বা উত্ত্যক্ত করা একটি মেয়ের মনোজগতে কী ভয়ানক প্রভাব ফেলে তা আমরা যৌন উৎপীড়নের কারণে ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার হার দেখেই বুঝতে পারি। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারি এটা কতটা কষ্ট দেয় মনে। একবার আমি জ্যামে রিঙ্গায় বসে ছিলাম এক লোক রিঙ্গার পেছন থেকে কুর্দিসতভাবে আমার শরীরে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছিল, তখন আমার একই সাথে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণার অনুভূতি হচ্ছিল। চিন্তা করছিলাম আমি এখন রিঙ্গা থেকে নেমে তার পেছনে স্যান্ডেল নিয়ে ধাওয়া করব কিনা। কিন্তু আমি এটাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম যে তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকতে পেরেছিলাম শুধু, নড়তে পারিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম যখন লোকটি এমন একটি অন্যায় করার পরও আমার কঠিন চোখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন কিছুই হয়নি। আমি এখনো ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি। এই ঘটনায়ই যদি আমার এই অবস্থা হয় তাহলে আমি বুঝতেই পারছি সে মেয়ের অবস্থা যাকে প্রতিদিন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে উত্ত্যক্ত করা হয়, তার পিছু নেওয়া হয়। অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয় যখন এ ঘটনার পর মন শক্ত করে প্রতিবাদ করতে শেখাতে তার পরিবারের কেউ এগিয়ে আসে না বরং তাদের তথাকথিত মান-সম্মান রক্ষার নামে বা অগ্রীভূতির পরিস্থিতি এড়াতে তার পড়ালেখা বন্ধ করে দেওয়া হয় বা তাকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটির সামনে থাকে একটি অনিচ্ছার জীবন অথবা আত্মহত্যার পথ।

একে আমি “লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন” বলব কারণ এটা হয় এক ধরণের বিকৃত রূচির মানুষের কাজ যারা মেয়েদের প্রতি কোন সম্মান ধারণ করে না মনে। এরা মেয়েদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করাকে নিজেদের পৌরুষ দেখানোর খুব ভাল উপায় বলে মনে করে। এর মূলে রয়েছে তাদের পরিবারে, সমাজে এমনকি গণমাধ্যমগুলোতেও নানাভাবে নারীর অবমূল্যায়ন।

শুধু আইন করে যে এ ব্যাপারটা ঠেকানো যাবে না তা বলাই বাহুল্য। কারণ আইনের যথাযথ প্রয়োগও তো দরকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুলিশ এধরণের মামলা নেয় না, মামলা নিলেও অপরাধীদের ধরার উদ্দেশ্য নেয় না, আবার অপরাধীরা ধরা পড়লেও তারা সামান্য মুচলেকা দিয়ে বা নিজেদের প্রভাবের জোরে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। আর বেরিয়ে দিয়েই তারা মেয়েটির জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। মেয়ের মুখে এসিড নিষ্কেপ, মেয়েকে তুলে নিয়ে ধাওয়া, মেয়ে ও তার আত্মীয়-স্বজনকে হৃষকি দেওয়া, তাদেরকে প্রহার বা খুন করার ঘটনাও ঘটে অনেক সময়। এবং এসব অপরাধ করেও তারা আগের মতই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে

বেড়াতে পারে। মেয়ের অভিভাবকেরা যে তাদের মেয়েদের পড়া বন্ধ করে তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে দেন তার একটি প্রধান কারণ কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর এহেন নিক্ষিয়তা।

তবে আশার বিষয় হল, ভ্রাম্যমান আদালতকে ইভ টিজিং বা উভ্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই ধারা প্রয়োগ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করতে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। তবে অর্থদণ্ডের পরিমাণ উল্লেখ থাকছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জনায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্প্রতি দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামতে বলেছে, সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯-এ দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইভ টিজিং বন্ধের জন্য পৃথক কোনো আইন করার প্রয়োজন হবে না। তবে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বর্তমানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটোরা ফৌজদারি কার্যবিধি ও দণ্ডবিধির অধীনে ৯২টি আইনের প্রয়োগ করতে পারেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের মাধ্যমে তাঁরা এসব ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। তবে কোনো মামলা নিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে মামলা পাঠাতে হয়। দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় ইভ টিজিং অর্থে বলা হয়েছে, ‘কোনো নারীর শালীনতার অর্মান্যাদার অভিপ্রায়ে কোনো মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজকে বোঝাবে। কাজ অর্থ স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের রাস্তাঘাটে দেখে শিশ দেওয়া, গান গাওয়া, চোখ বাঁকা করে তাকানো, নারীর শালীনতা অর্মান্যাদা করার অভিপ্রায়ে কোনো মন্তব্য, কোনো শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ মন্তব্য, শব্দ নারী শুনতে পায় বা বস্তু দেখতে পায় কিংবা কোনো নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশকেও ৫০৯ ধারায় অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে।’

বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে আইনে বলা হয়েছে, কাউকে এই ধারায় অভিযুক্ত করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ প্রামাণ করতে হবে: কী মন্তব্য করা হয়েছে, কোন শব্দ করা হয়েছে, কী ধরনের অঙ্গভঙ্গি করা হয়েছে, কী বস্তু প্রদর্শন করা হয়েছে এবং কোনো নারীর নিভৃতাবাসে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রবেশ করেছেন কি না অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো নারীর শালীনতায় অর্মান্যাদা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কি না।

জানা যায়, ৫০৯ ধারায় প্রকাশ্য মাতাল ব্যক্তির অশোভন আচরণের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারবেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ ব্যাপারে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ.এস.এম শাহজাহান বেশ গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছেন। তিনি ‘গ্রথম আলো’কে বলেছেন, ইভ টিজিং রোধে পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে সরকারকে বেরিয়ে আসতে হবে। উভ্যক্তকারীরা যৌন উৎপীড়ক, তারা হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। তবু এখনো পুলিশের খাতায় দাগি আসামি বলতে বোঝায় সিঁথেল চোর-পকেটমারদের। কেন এখনো উভ্যক্তকারীদের নামে থানায় খাতা খোলা হচ্ছে না?

ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় শিক্ষক মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যে বখাটেদের হামলায় চাঁপা বানী ভৌমিক নামের একজন মা নিহত হন। এখন প্রয়োজন আইন অনুযায়ী উভ্যক্তকারী পলাতক সন্ত্রাসীদের ধরতে ছবিসহ তালিকা প্রকাশ করা।

আইন যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ইত্যাদির আওতায় উভ্যক্তকারীদের সাজা দেওয়া যায়। কিন্তু উভ্যক্তের শিকার হচ্ছে যে মেয়েরা, তাদের পরিবারগুলো নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে থানা বা আদালতে যাচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা স্বাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য কোনো আইন নেই। যাঁরা আইনের অশ্রয় নেন, তাঁরা আরও বেশি হেনস্তা হন।

তবে ইভ টিজিং রোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা স্থানীয় সরকারগুলো নিতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় কারা মেয়েদের উভ্যক্ত করছে, সে সম্পর্কে স্থানীয় সরকার পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকে। তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হলে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কার্যকরভাবে এদের প্রতিরোধ করা যাবে। প্রয়োজনে শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে ব্ল্যাক রেজিস্ট্রার খুলতে হবে। উভ্যক্তকারীদের নাম এ তালিকায় থাকলে সে সরকারি চাকরি পাবে না, এমন বিধান রাখা উচিত।(১)

ইভ টিজিং এর কারণে মৃত্যুকে হত্যা ধরতে হবে কারণ বখাটেদের অত্যাচারের কারণে আত্মহত্যাকেও আমি এক ধরণের খুনই বলব। যদি সকল মহলের চাপ উপেক্ষা করে মিজানুর রহমান ও চাঁপা বানী ভৌমিকের হত্যাকারীদের শাস্তি হয় এবং তা দ্রুত হয় তাহলে এ দৃষ্টান্ত এ অপরাধ রোধে অনেক সহায়তা করবে।

“যৌন হয়রানি” বন্ধ করার জন্য আসলে আক্ষরিক অর্থেই সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমেই এগিয়ে আসতে হবে পারিবারিকভাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভুক্তভোগী মেয়েটির পরিবারই পরোক্ষভাবে মেয়েটির হাতে বিবের পাত্র বা ফাঁসির দড়ি এগিয়ে দেন। তাকে বোঝাতে হবে, তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে যাতে তার মন দুর্বল হয়ে না পড়ে। খোঁজ নিতে হবে বাড়ির ছেলেটি কী করছে, কার সাথে মিশছে। বাড়িতে নারীদের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। সবাইকে বুঝাতে হবে যে নারী আর পুরুষ কারোরই কারো উপর এমন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যার বলে একে অন্যকে নিপীড়ন করতে পারে।

~

## এটা উত্যক্তের শিকার মেয়েদের পোষাকের ব্যাপার নয় বরং উত্যক্তকারীদের অসুস্থ রুচির এবং ভয়াবহ সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয়ের পরিচয়। আর একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি একটি মেয়েকে উত্যক্তকারীদের ভয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বন্তাবন্দি বা গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হয় তাহলে আমার কাছে সে গণতন্ত্র মূল্যহীন।

~

আইনের অধীনে শাস্তি হোক আর না হোক সমাজের সবাই মিলে উত্যক্তকারীকে বয়কট করতে হবে। নিজের বন্ধুটি এ ধরণের কাজে জড়িত থাকলে তাকে বোঝাতে হবে। এ ব্যাপারটি নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করতে হবে। শুধু নিজে বিরত থাকলেই হবে না, অন্যকে বিরত রাখতে হবে এবং সম্মিলিত প্রতিবাদ করতে হবে। আর যৌন হয়রানির শিকার বোন বা বান্ধবীটিকে আত্মবিশাসী হতে সাহায্য করতে হবে। আর এ ধরণের চিন্তা ভাবনা ছাড়তে হবে যে মেয়েরা বোরকাবন্দি হয়ে থাকলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কারণ আরব দেশগুলোতে কিন্তু বেরকা পরা মেয়েরা এ জন্য ব্যাপারের শিকার হচ্ছে। এটা উত্যক্তের শিকার মেয়েদেও পোষাকের ব্যাপার নয় বরং উত্যক্তকারীদের অসুস্থ রুচির এবং ভয়াবহ সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয়ের পরিচয়। আর একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি একটি মেয়েকে উত্যক্তকারীদের ভয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বন্তাবন্দি বা গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হয় তাহলে আমার কাছে সে গণতন্ত্র মূল্যহীন।

### রূমানা মঙ্গুর ও নরকদর্শন

রূমানা মঙ্গুর এখন এক পরিচিত নাম। তাকে নিয়ে ফেসবুক, ব্লগ ছাড়াও মুখে মুখে ফিরছে আলোচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এই শিক্ষিকা আজ দেখিয়ে দিয়েছেন আমরা এখনো আসলে কোথায় আছি। রূমান আজ বিচানায় পড়ে কাতরাচ্ছেন, তার বাঁ চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, ডান চোখও প্রায় গেছে, নাকে এবং সারা শরীরে কামড়ের ভয়ানক দাগ। আর এসবই করেছে তার স্বামী হাসান সাঈদ। কিজন্য জানেন? তার সন্দেহ ছিল রূমানা কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য

গিয়ে এক ইরানি ছেলের প্রেমে পড়েছিলেন এবং তার সাথে প্রেম চালিয়ে আসছিলেন। আমি শুধু এই পুরো ঘটনার মাঝে দিয়ে আমাদের সমাজের মানসিকতা দেখার চেষ্টা করব।

একদল এ ঘটনায় মনে করেছেন-

১। মেয়েটারই তো সমস্যা ছিল, তার নিজের দোষেই তো তার এই দুর্দশা। স্বামী সন্তান ফেলে প্রেম করবা আর শাস্তি পাবানা? এই ধরণের মেয়েদের জন্যই সুস্থ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন নষ্ট(!)হয়।

২। একদল মনে করেছেন মেয়েটা কেন আগে বের হয়ে আসেনি? এটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। কেন এরকম মোটামুটি মূল্যহীন স্বামীর ঘর করে আসছিলেন তিনি এতদিন, যে কিনা সংসারের ভরণপোষণের যোগ্যতা বা সামর্থ্যও রাখত না?

এর উত্তর হচ্ছে সমাজ। আমাদের সমাজে পুরুষের ছায়া ছাড়া কোন একাকী মেয়ের জীবন যে কতটা দুর্বিশহ হতে পারে সেকথি বলাই বাহ্য্য। আমাদের সমাজে একজন লোক একজন মহিলাকে তার স্ত্রী বানিয়ে রোখেল চালালেও সমাজ ততটা বাধা দেয়না যতটা দেয় কোন যুবতী বা ডিভোর্স বা বিধবা মহিলা এমনকি তার সন্তানকে নিয়ে কোন বাসা ভাড়া নিতে চাইলে। কারণ পুরুষ যত অর্থব্যবস্থা বা অকর্মণ্যই হোক সে একজন নারীর মাথার উপরের ছায়া! মনে করুন আমাদের সমাজের একজন পঙ্গু, মদ্যপ ও বেকার লোক, যাকে তার স্ত্রী আয় করে খাওয়ান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পরিবারের কর্তা কে হন বলুন তো? অবশ্যই ওই পুরুষ! একজন ডিভোর্স বা বিধবা মহিলা আমাদের সমাজে বাসা ভাড়া পাবেন না সহজে, চাকরি পাবেন না সহজে, বাবার বাড়িতে থাকলেও দুদিন পরেই শুরু হবে গঞ্জনা, প্রতিবেশীরা তার দিকে প্রথমে করণ্ণা আর তার পরে ঘৃণার চোখে তাকাবে, উনি তার মেয়েকে বিয়ে দিতে সমস্যায় পড়বেন, উনার ও উনার বাবার পরিবারের সম্মানহানি হবে কারণ সেই মেয়েটি হয়ত তার জন্য অবোগ্য একজন মানুষকে ত্যাগ করে এসেছে বা কোন কারণে তার স্বামীকে হারিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে রূমানার ওই সংসারে থেকে যাওয়ার জন্য পুরোগুরি কি আমরা তাকে দোষ দিতে পারি, বলতে পারি যে এটা সম্পূর্ণই তার সিদ্ধান্ত ছিল যেখানে সমাজ আমাদেরকে বিশেষ করে মেয়েদেরকে বেঁধে দেয় কী ধরণের আচরণ সে করতে পারবে?

মোটামুটি অধিকাংশ মানুষের কাছেই রূমানার ব্যাপারটা খুব অবাক করার মত কিছু না, যেন এটাই স্বাভাবিক। এমনকি আমার সামনে এক নারীকে বলতে শুনেছি, “আহারে ওই শয়তানটা মেয়েটার কী অবস্থা করেছে! থাক, স্বামী স্ত্রীর যেই জায়গাটাতে আঘাত দেয় ওই জায়গাটুকু বেহেত্তে যায়!”

আর একথা খোদ হাদিসেই আছে (দুঃখিত সূত্র দিতে পারছি না এই মুহূর্তে)। ওই পশ্চিম এখনো স্থামী! ভূত্যের প্রতি যত অন্যায়ই করুক না কেন সে প্রভু। সাঈদ রূমানার মুক্তির উপায়! রূমানার তো তাহলে উচিত সারা শরীরের প্রতিটি জায়গায় সাঈদের আঘাত নেওয়া যাতে তার শরীরের কোন টুকরোই বাদ না যায় বেহেস্তের ছোঁয়া পাওয়া থেকে!

রূমানার এ ঘটনা ঘটেছিল নাকি গত ৫ই জুন, আর এ ঘটনা মানুষে সামনে এসেছে ১৩ই জুন। এর কারণ কি এটা হতে পারে না যে এই সমাজে “স্থামী” হবার কারণে সে এ কদিন সেলিব্রেটি হওয়ার আর লাল দালানের আতিথেয়তা পাবার পথ থেকে দূরে ছিল?

আমি অনেকের মত মনে করছি না সাঈদ নেহাতই কুৎসা ছড়াচ্ছে রূমানার ব্যাপারে- এর পেছনে গুট উদ্দেশ্য আছে। ইরানি ছেলের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটা পুরোটাই ভুয়া। তারা এই কথাগুলো ভাবছে কারণ অপরিক্ষার চরিত্রের কোন মেয়ের পক্ষ নিলে যে এই সমাজে আমাদের মান থাকে না!

রূমানার প্রেমের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়ও তবু আমি তার পক্ষ নিতে বিন্দুমাত্র দিখা করছি না, কারণ কাবিনামায় স্বাক্ষর করে কারো ইচ্ছা, বাসনা বা স্বাধীনতাকে কিনে নেওয়া যায় না, কেউ আমাকে পছন্দ না করলে তার গায়ে হাত তোলাও যায় না, তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করা যায় না (যদি আমি নিজেকে আর আমার সাথীকে মানুষ হিসেবে ভাবতে চাই, আর যদি তা না ভাবি সভ্যতা তো আমার জন্য নয়)। কেউ আজ আমাকে ভালবাসছে বলে আমি তাকে বাধ্য করতে পারি না সারাজীবন আমাকে ভালবাসতে, বা আমি কাউকে নিজের করে রাখতে চাই বলে কাউকে বাধ্য করতে পারি না আমার নিজের হয়ে থাকতে।

সাঈদের এ ধরণের পাশবিক আচরণও কিন্তু সমাজ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। একজন পুরুষ আমাদের সমাজে “আমি নারী চেয়ে উচ্চতর” এ ধরণের মনোভাব নিয়েই আসে, সে যখন দেখে সেই “নিম্নতর” জীবাটির চেয়ে সে ব্যর্থ তখন তা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিকরই বটে। আর সেই নিম্নতর জীবাটি যদি স্বাধীনতাবে যোগ্যতর কাউকে বেছে নিতে চেষ্টা করে তা তো আরো অসহ্য। এখন উপরোক্ত সব ঘটনাগুলো যদি হাসান সাঈদকে অসুস্থ করে ফেলে তাহলে তার পক্ষে এ ধরণের জঘন্য কাজ করা সম্ভব। সে স্থামী, আর এক নিম্নতর জীব নারীর তার চেয়ে যোগ্য হবার স্পর্ধা সে গুড়িয়ে দেবে না? সাঈদের মত অসুস্থ কিন্তু সবাই না, কিন্তু সমাজ ও ধর্মীয় কিছু বিধান যে তাদেরকে অসুস্থ করে তুলতে পারে তা তো বলাই বাহ্যিক।

ধর্মগুরু থেকে কিছু উদাহরণ নিচে দিলাম:

সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে রয়েছে: পুরুষের অবস্থান নারীদের চেয়ে উপরে।

সুরা নিসা’র ১১ নং আয়াতে রয়েছে: একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোকের সমান।

এছাড়াও পুরুষকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে নারীকে দেওয়া হ্যানি। আর হাদিসে তো বলাই হয় স্থামীর হাতে স্ত্রীর শরীরের যে অংশ আঘাত পাবে, সেই অংশ বেহেস্তে যাবে। এছাড়াও স্থামী যখনই স্ত্রীকে মিলনের জন্য ডাকবে স্ত্রী যে কাজই করুক না কেন ছুটে আসতে হবে; আর কোন স্ত্রী যদি স্থামীর চাহিদা পূরণ না করে তাহলে নাকি ফেরেস্তারা সারারাত সেই স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকে। পুরুষের জন্য চার বিয়ের স্বয়েগ তো রয়েছেই।

আর স্ত্রীকে প্রাহার করা কিন্তু ধর্মসম্মতই! সুরা নিসায় বলা হয়েছে- “পুরুষ নারীর নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং রক্ষাকর্তা, কেননা আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (শারীরিক শক্তির বিচারে) এবং যেহেতু পুরুষ অর্থ দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করে। তাই সতীসাধ্বী নারীরা হবে একান্ত অনুগতা-বাধ্যগতা, স্থামীর অবর্তমানে আল্লাহর নির্দেশিত পথ অন্যায়ী তাদের ইজ্জত আবু রক্ষা করবে। যে সকল স্ত্রী থেকে অবাধ্যতা এবং খারাপ আচরণের আশংকা করো, তাদের মৃদু তরিক্ষার করো, অতঃপর তাদের সঙ্গে শয্যা বর্জন করো এবং অতঃপর তাদের প্রাহার করো।”

আরো শুনেছি

- “স্ত্রী যদি বশ না মানে, তাহলে স্থামী তাকে উপহার দিয়ে কিনতে চেষ্টা করবে, আর তাতেও কাজ না হলে হাত বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।”

- “স্থামী তাহার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রাহার করিতে পারে, এর মধ্যে একটি, স্থামীর বিনা অনুমতিতে কাহারও বাড়িতে বেড়াইতে গেলে”

হাসান সাঈদ ধর্মসম্মত কাজই করেছেন, যেজন্য রূমানা বেহেস্তবাসী হতে চলেছিলেন নরক যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে।

এভাবে যদি সমাজের ও ধর্মের শিক্ষার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়েই নারীকে নিম্নতর প্রাণী হিসেবে জানতে থাকে তাহলে তো নারীর অর্ধমানুষ বা নিম্নতর জীব আর পুরুষেরা অমানুষ হয়েই থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। <http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-10-29/news/105057>

২। <http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-10-29/news/105058>

লীনা রহমান, ছাত্রী, প্রচলিত সকল ধর্মে অবিশ্বাসী, বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল, মুক্তমন্দির ইগার